# শম্ভু মিত্র ঃ স্বনির্বাসিত রাজা

সাগর বিশ্বাস

তিনি বলেছিলেন, আমি ঠিক করেছিলুম থিয়েটারে আমি থাকবই----অভিনয় করে বা পরিচালনা করে, তা যদি না পারি সেট্স করব কিম্বা লাইট করব, তাও যদি না পারি তবে প্রম্পট করব, সেটাও যদি করতে না দেয় আমি দর্শকদের সীট দেখিয়ে দেব---- আশারিং করব। থিয়েটার আমাকে তাড়াতে পারবেনা।

বিগত দুই দশক ধরে কিন্তু দেখা গেল অভিনয় বা পরিচালনা, মঞ্চসজ্জা কিংবা আলোক সম্পাত তো দূরের কথা, সমকালীন থিয়েটার দেখাতেও তাঁর ঘোর অনীহা। দুই দশক ধরে তাঁর স্বেচ্ছানির্বাসিত ব্যক্তিত্বের চারপাশে এক অভিজাগতিক আলোকবলয়। তিনি মীথ, জীবদ্দশায়। দুই দশক বলছি এই কারণে যে প্রকৃত পক্ষে ১৯৭৮ সাল থেকেই থিয়েটারের সাথে তাঁর বিশেষ কোনও যোগ ছিলনা। মাঝে মধ্যে যেটুকু দেখা গেছে তা নিতান্তই বর্ষণক্লান্ত সন্ধ্যার আকাশে উঁকি দিয়ে যাওয়া শুক্লা দ্বিতীয়ার চন্দ্রকলার মতো। যেমন, ১৯৮০ তে ক্যালকাটা রেপার্টরী থিয়েটার প্রযোজিত গালিলেওর জীবন, ৮১-তে কলকাতা নাট্যকেন্দ্রের মুদ্রারাক্ষস এবং ৮৫তে বৈদিক প্রযোজিত দশচক্র তে নেমেছিলেন তিনি। এরপরে আর কোনওদিন তাঁকে মঞ্চাভিনয়ে দেখা যায়নি। প্রায় নিছিদ্র বারোটি বছর। ৭৮ সালে বহুরূপী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর থেকে আধুনিক ভারতীয় থিয়েটারের জনক শম্ভু মিত্র পিতামহসুলভ নিরাসক্তির মধ্যে আশ্রয় খুঁজে নিয়েছিলেন। অপরিসীম ভক্তি, আনুগত্য ও আকাঙ্ক্ষা ঢেলে যাঁরা তাঁকে নিয়ে আসতে সমর্থ হয়েছেন, কেবল তাঁদের নাটক দেখেছেন মাঝে মাঝে। সেখানেও লক্ষণীয় যে দুটো আসন বরাদ্দ থাকলেও এসেছেন তিনি একাই। আইলের পাশে বসেছেন। পরের আসনটি খালি। আম দর্শকের গায়ে গায়ে বসার প্রশ্ন নেই। গ্রীনমে অপেক্ষমান থাকলে তাঁর সাথে এক আসনে বা এক পংক্তিতে কারও বসার দৃশ্য সচরাচর হয়নি। ভদ্রোচিত দূরত্বে বিনম্র শ্রদ্ধায় কথা বলতে পারেন কেবল কিছু থিয়েটার ব্যারনস্।থিয়েটারের রামশ্যামদের সাহসই হয়নি সেই জীবন্ত নিরাসক্তির সামনে দাঁড়ানোর । তাঁরও কোনও স্পৃহা ছিল না তাঁদের মধ্যে এসে সযত্নলালিত নির্বাসনের মহিমা চূর্ণ করার। এই দীর্ঘ স্বনির্বাসিত সময়ের মধ্যে থিয়েটারে ক্বচিৎ পদার্পণ ছাড়া তাঁর কাছে আমরা পেয়েছি কিছু আবৃত্তি - ক্যাসেট আর কিছু লেখা ( হয়তো আরও কিছু লিখেছেন,ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে)। তাঁকে নিয়ে লেখা বা কাজ করার অনেকের অনেক প্রস্তাবেই নিস্পৃহ থেকেছেন। কিন্তু পারেননি ঘনিষ্ঠ বন্ধু নেমিচাঁদ জৈনের মেয়ে কীর্তিকে ফেরাতে। পারেননি দূরদর্শনের জন্য সলিল বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা স্নেহভাজন রাজা সেনকে বিমুখ করতে। পারেননি কথাটা কি প্রযুক্ত হল ? ইচ্ছে করলে কি আর পারতেন না ? পারতেন নিশ্চয়ই। করেননি।

করেননি তাতে মানুষের কল্যাণই হয়েছে। ও প্রসঙ্গেই মনে পড়ে যায় বঙ্গসংস্কৃতি জগতের আর এক জীবিত মীথের কথা। সুচিত্রা সেন তিনি যত যবনিকার আড়ালে আত্মগোপন করেন ততই মিডিয়ার কৌতুহল বাড়ে। একবার যদি সন্তর্পণেও ঘরের বাইরে আসেন, তা বাড়ি বিক্রির ব্যাপারে আয়কর দপ্তরেই হোক কিংবা ভোটের ছবি তোলাতে নির্বাচন কমিশনের ফটোগ্রাফারের সামনেই হোক---শোরগোল পড়ে যায়। কাউকে সাক্ষাৎকার দেননা কিন্তু সাংবাদিক বন্ধু অমিতাভ চৌধুরী ব্যক্তিগত ছবি সহযোগে তাঁকে নিয়ে সাময়িক পত্রিকায় লিখলে বা বই প্রকাশ করলে খুশিই হন। নিজেকে দুর্লভ করে প্রচারের আলোয় রাখার এ-ও কি এক রকমের পন্থা ? হয়তো বা।

বিগত দুইদশক ধরে বিশেষত ১৯ মে ১৯৯৭ তাঁর বিস্ময়কর ও ব্যতিক্রমী অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব এবং বুদ্ধিজীবীদের লেখাপত্রের মধ্যে যে কথাটা বেরিয়ে আসছে তা হল শম্ভু মিত্রের তীব্র অভিমানই তাঁর স্বেচ্ছানির্বাসনের কারণ। তাঁর ইচ্ছাপত্রের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর আত্মমর্যাদাবোধ দেখে আপ্লুত হয়েছেন। যেন এরকম একটি ইচ্ছাপত্র রচনা না করলে তাঁর আত্মমর্যাদা ক্ষুন্ন হত। লেখকেরা তথাকথিত অভিমানেরও কোনও স্পষ্ট ব্যাখ্যা করেননি----

করছেন না। কেন অভিমান ? কার উপর অভিমান ? ইচছাপত্রের মধ্যে যে অজস্র সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞত ার শেষ নেই বলে ঘোষণা রেখে গেলেন, দীর্ঘ দুটি দশক তাদের দিকে পেছন ফিরে রইলেন কেন এসব প্রশ্নের বিস্তারিত জবাব হয়তো কোনওদিনই পাওয়া যাবে না। কারণ এদেশের লেখক- গবেষকেরা সাধারণত অনেক নিরাবরণ সত্যকেও কোমল আচছাদনে রাখতে অভ্যস্ত। অনেক ক্ষেত্রে সত্যের কাছে পৌঁছতে অসমর্থ। তবে ইচছাপত্রের মধ্যেই এমনকী রাজা সেনের টেলিফিল্মে তিনি যে ইঙ্গিত রেখে গেলেন তা অনেকেরই অস্বস্তির কাঁটা হতে পারে । সে কথা পরে। তার আগে আধুনিক ভারতীয় থিয়েটারের জনক শম্ভু মিত্রের অকাল নির্বাসনের প্রেক্ষাপটে একবার আমরা চোখ বুলিয়ে নিতে পারি।

দুই

শম্ভু মিত্রের জন্ম কলকাতায় ডোভার রোডে ২২ আগস্ট ১৯১৫। ডোভার রোডের সে বাড়িটা ছিল তাঁর মায়ের। ছেলেবেলায় মাতৃবিয়োগ হয়। মায়ের নাম ছিল শতদলবাসিনী। দুই ভাইকে নিয়ে বাবার কাছেই তাঁর মানুষ হওয়া। ব াবা শরৎ মিত্র ছিলেন স্বল্পভাষী, উদাসীন ও অভিমানী প্রকৃতির মানুষ। ছেলেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একধরনের নিরাসক্ত ভাবনা ছিল তাঁর। শম্ভু মিত্র নিজে বলেছেন, বাবা কিরকম একটু অভিমানীও বটে, আরেকটু .... ভাবটা হচ্ছে, ঠিক আছে তোমাদের নিজেদের জীবন তোমরা ঠিক করে নেবে... নিজের জীবনটা নিজেকেই বাঁচতে হবে। সুতরাং নিজেরা ঠিক করে নিও যে নিজে কী করতে চাও এবং নিজে কেমন করে বাঁচবে। অবসর নেবার পর শরৎবাবু কলকাতা ছেড়ে এলাহ াবাদে স্থায়ী বসবাস শু করেন। আর ফেরেননি। তার এইরকম একটা ধারণা ছিল যে বাঙালিরা কিছু করবেনা, খালি চ ায়ের দোকানে বসে আড্ডা মারবে আর পরচর্চা করবে।

শম্ভু মিত্র এলাহাবাদে বাবার কাছে বছর দুয়েক ছিলেন। লেখাপড়ার ইতি টেনেছেন আগেই। ছেলেবেলা থেকেই নাটক ও কবিতা পাঠের প্রতি আকর্ষণ ছিল। পুঁথিগত পড়াশুনো ভালো লাগত না। সেই অনীহা চরমে পৌঁছয় সেন্টজেভিয়ার্স কলেজে পড়তে পড়তে। এককথা ঘ্যানর ঘ্যানর অসহ্য হয়ে ওঠে। পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে এলাহাবাদে বাবার কাছে গিয়ে ওঠেন। সেখানে বছর দুয়েক কাটিয়ে মনে হল যে আমার এই কুড়ি বছর বয়স হয়ে যাচ্ছে, একুশ বছরে পড়েছি, ত া আমি এখনও বাপের হোটেলে আছি। কী লজ্জার কথা। আমার তো নিজে খেটে খাওয়া উচিত। একদিন বাবাকে বললুম যে আমি চললুম কলকাতায়। একটা সুটকেস আর বিছানা বগলদাবা করে এলাহাবাদ থেকে বেরিয়ে পড়লুম। তারপর থেকে কলকাতাতেই থেকেছি। অবশ্য বহুবছর পরে আর একবার বাপের বাড়িতে কাটিয়েছিলেন মাসখানেক -- -দেরাদুনে।

কলকাতায় একুশ বছর বয়সে শু হল শম্ভু মিত্রের নাট্যজীবন। সেই প্রথম জীবনের স্মৃতিচারন করতে গিয়ে নিজেই বলেছেন আমি যে বাড়িতে থাকতাম, সে এক ভদ্রলোক, তাকে দাদা বলি, তিনি খুব আদর করে----ভগবান জানে কেন আমাকে তাঁর বাড়িতে রেখেছিলেন, আর সে বাড়িতে আমি ছিলুম আট ন- বছর। খুবই তোফা থাকতাম। কিছু রোজগ ার করি আর না করি, কিছু এসে যাচ্ছে না। সে বেশ, খাই থাকি, সে বাড়িতে আরামে আছি। সেইখানে একজন এসে বললেন ----কী শম্ভুবাবু থিয়েটারে ঢুকবেন ? আমি ঢুকিয়ে দিতে পারি।.....তা আমি বললাম দূর, গিয়ে কী হবে ? তা যে ভদ্রলোকের বাড়িতে আমি ছিলাম, তিনি হঠাৎ বললেন, তুমি আমাদের কাছে তো থিয়েটার সম্পর্কে এতসব বড় বড় কথা বলো---- এইটা হলে হত, ঐটা হলে হত, এ রকম করে করা উচিত ।---- তো যাওনা, নিজে গিয়ে একবার করে দ্য াখাওনা। তা এইটে বড়ো গায়ে লাগল তখন, বয়সও অল্প, তো আমি ভাবলুম তাহলে ঢুকব। সুতরাং ঢুকলাম। .....রঙমহলে প্রথম।

এখানে কয়েকটা পুরনো নাটকে অভিনয় করার পর শু হল বিধায়ক ভট্টাচার্যের নতুন নাটক ..মালা রায়.. । তারপর গৌর শী-র ঘূর্ণি, প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের রত্নদ্বীপ ( নাট্যরূপ - বিধায়ক ভট্টাচার্য)। মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের সঙ্গে

রঙমহলেই পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা। রঙমহল উঠে যাবার পর মিনার্ভা ছাড়তে হল, মহর্ষিকে কে বুঝি একটু অসম্মান করেছিল, সেজন্যে আমি সে থিয়েটারটা ছেড়ে দিয়ে আসি আর করিনি সেখানে। পরে ভূমেন রায় আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন নাট্যনিকেতনে। নাট্যনিকেতনে .. কালিন্দী.. করার পর নাট্যনিকেতন উঠে যায়, শ্রীরঙ্গম হয়। তখন মহর্ষি তঁাকে নিয়ে আসেন শিশির ভাদুড়ীর কাছে। এখানে জীবনরঙ্গ উড়োচিঠি ইত্যাদিতে অভিনয় করার পরযে কারণেই হোক আবার বিদায়। সে সময় কালীপ্রসাদ ঘোষ বি. এস. সি নামে এক ভদ্রলোক একটা ভ্রাম্যমান দল করেছেন। সেখানে ভূমেন রায়, নরেশ মিত্র, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, রবি রায়, জীবন গঙ্গোপাধ্যায় এঁরা আছেন। একদিন ভূমেন রায় সেখানে নিয়ে গেলেন। এখানে কাজ করতে মন্দ লাগছিল না। কিন্তু শম্ভু মিত্র বাইরে থাকতে চাইতেন না বলে দলের মধ্যে একটু আধটু অসুবিধে হত। তিনি প্রায়শই কলকাতায় চলে আসতেন বলে কালীপ্রসাদ বাবু র বেশ অভিমান টভিমান হত। এইরকম করতে করতে ঠেক খেতে খেতে মনে হল ----দূর এ থিয়েটারে সুবিধে হবে না ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে বসে রইলুম।

এদিকে তখন ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ তৈরি হয়েছে। সেখানে নাট্যচর্চাও হবে। বিনয় ঘোষ আর বিজন ভট্টাচার্যের অনুরোধে শম্ভু মিত্র এখানে যোগ দিলেন। ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ পরে প্রগতি লেখক সংঘ রূপান্তরিত হয় এবং এখান থেকেই গড়ে ওঠে গণনাট্য সংঘ। গণনাট্য সংঘে অন্যান্য নাটকের সাথে শম্ভু মিত্র অভিনীত উল্লেখযোগ্য নাটক আগুন. লেবরেটরী, হোমিওপ্যাথি, জবানবন্দী।

পরিচালক হিসেবে প্রথম আত্মপ্রকাশ নবান্ন - য়, বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে যুগ্মভাবে। এখানে কাজ করতে করতে ১৯৪৫ সাদে তৃপ্তি ভাদুড়ীকে (বিজন ভট্টাচার্যের মাসতুতো বোন, দলের সপ্রতিভ অভিনেত্রী) বিয়ে করেন। ১৯৪৮ সালে গণনাট্য সংঘের সাথে সম্পর্কে ছেদ। মহর্ষি সহ আরও কয়েকজনকে নিয়ে তৈরি হল অশোক মজুমদার নাট্য সম্প্রদায়, পরে মহর্ষি নতুন নামকরণ করেন বহুরূপী। ১৯৪৮ সালেই বহুরূপীর যাত্রা শু নবান্ন নাটক দিয়েই।

১৯৪৮----নবান্ন ; ১৯৪৯----পথিক ; ১৯৫০----ছেঁড়াতার, উলুখাগড়া ; ১৯৫১ ---চার অধ্যায় ; ১৯৫২---দশচত্র ; ১৯৫৩---ধর্মঘট ; ১৯৫৪---রক্তকরবী ; ১৯৫৮---পুতুল খেলা ; ১৯৬৭---মুক্তধারা ; ১৯৬১----বিসর্জন, কাঞ্চনরঙ্গ ; ১৯৬৪--- রাজা, রাজা অয়দিপাউস ; ১৯৬৭----বাকি ইতিহাস ; ১৯৬৯----বর্বর বাঁশি ; ১৯৭১----পাগলা ঘোড়া, অপরাজিতা, চোপ আদালত চলছে।

এই উনিশটি নাটকের মধ্যে ..দশচত্র.. ও ..ছেড়াতাঁর ..----এই দুটি নাটক দ্বিতীয়বার প্রযোজিত হয়েছে যথাত্রমে ১৯৬২ ও ১৯৬৫ সালে। অপরাজিতা ছাড়া প্রতিটি নাটকের পরিচালক শম্ভু মিত্র। ১৯৭২ সালে টেরোড্যাক্টিল নামে ইন্দ্র উপাধ্যায়ের একটি নাটক পরিচালনা করলেন তৃপ্তি মিত্র। চবিবশ বছরের ধারাবাহিকতায় মোট একত্রিশটি নাটকের তিনটির পরিচালনা তৃপ্তি মিত্রের। তৃপ্তি পরেও কয়েকটি পরিচালনা করেছেন। কিন্তু ১৯৭১-এর পর থেকে বহুরূপীর কোন নাটক শম্ভু মিত্রকে পরিচালনা করতে দেখা গেল না। ১৯৭৬--এ ম্যাগসেসাই পাবার আগেই ভারত সরকার দিয়েছেন পদ্মভূষণ। পরে ভারত সরকারের সঙ্গীত নাটক আকাদেমি কিংবা কালিদাস পুরস্কার গ্রহণ করলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দীনবন্ধু পুরস্কার এমনকি নাট্য আকাদেমির সভাপতির পদ প্রত্যাখ্যান করেছেন। বিশ্বভারতীর দেশিকোত্তম উপাধি কিংবা রবীন্দ্র ভারতীর নাট্যবিভাগীয় প্রধানের পদ অবশ্য প্রত্যাখ্যাত হয়নি।

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগে রবীন্দ্রসদনে অনুষ্ঠিত নাট্যোৎসবে বহুরূপীর চার অধ্যায় অভিনীত হয়। সেখানে শম্ভু - তৃপ্তি দুজনেই অভিনয় করেছিলেন। ১৯৭৮ সালে নবপর্যায়ে পুতুল খেলা প্রযোজনার সময়েই দলের মধ্যে সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। ওই বছর ১৬ জুন দশচত্র তে তিনি অভিনয় করেন, কিন্তু সেটাও বহুরূপীতে তাঁর শেষ অভিনয়। ১৫ আগস্ট আকাদেমিতে চাঁদ বনিকের পালা পাঠ করেছিলেন। তারপর থেকেই বহুরূপীর সাথে চিরতরে স

স্পর্ক ছেদ।

এর পরে আমরা দেখলাম ১৯৮০ সালে ফ্রিৎজ বেনেভিৎস নির্দেশিত গালিলেওর জীবন, ১৯৮১-তে দ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত নির্দেশিত মুদ্রারাক্ষস এবং ১৯৮৫ -তে বাংলাদেশের বন্যাত্রাণের জন্য পঞ্চম বৈদিক প্রয়োজিত দশচত্র - তে তাঁর কয়েকটি অভিনয়। ব্যস। তারপর আর তাঁকে মঞ্চে দেখা যায়নি।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘ থেকে শম্ভু মিত্রের বিদায়ের কারণ অনুধাবন করা কঠিন নয়। যে সকল কারণে বিজন ভট্টাচার্য, ঋত্বিক ঘটক, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সলিল চৌধুরি, উৎপল দত্ত, তাপস সেন, খালেদ চৌধুরী, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়দের মতো মানুষেরা গণনাট্যের মধ্যে কাজ করতে পারেননি, শম্ভু মিত্রও কমবেশি সেইসব কারণেই বেরিয়ে এসেছেন। তৎকালীন জাতীয় রাজনীতির বাতারবণ এবং কমিউনিস্ট পার্টির সংকট সম্পর্কে যাঁরা মোটামুটি ওয়াকিবহাল, তাঁদের কাছে এগুলি খুব বিস্ময়কর ঘটনাও নয়। বিস্ময় এখানেই যে সিকি শতাব্দী ধরে একচ্ছত্র আধিপত্যের পরেও নিজের হাতে গড়া দল বহুরূপী থেকে শম্ভু মিত্রকে বিদায় নিতে হল কেন সে তথ্য আজও পরিস্কার নয়। ব্যক্তিগত জীবনেও, যাঁকে পরম ভালোবাসায় জীবন সঙ্গিনী করেছিলেন এবং প্রকৃতপক্ষেও যিনি তাঁর মহিমান্বিত নাট্যজীবনের সার্থক নায়িকা ছিলেন, সেই তৃপ্তি থেকেও বিচ্ছিন্ন থেকেছেন। তিনি নিজে এসব বিষয়ে বিশেষ কিছু জানাননি। জানাননি বলেই অভিমান শব্দটির ব্যাপ্তি বেড়েছে। তাঁর স্ত্রী, কন্যা, এমনকি দলের গুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরাও আশ্চর্য নীরবতা অবলম্বন করেছেন। কিন্তু সত্যের জন্য, ইতিহাসের জন্য, এই কঠিন নৈঃশব্দের যবনিকা উত্তোলিত হওয়া কি জরি নয়?

তিন

পৃথিবীতে একরকম শিক্ষায় পরিপুষ্ট মানুষ আছেন, শিল্পী তো আছেনই, যাঁরা প্রাত্যহিক বাস্তবতার সাথে কোমর বেঁধে লড়াই করতে পারেন না। তাঁরা লড়াই -এর বড় বড় ছবি আঁকতে পারেন, মঞ্চে লড়াইকে বাস্তবায়িত করতে পারেন কিন্তু বাস্তবের লড়াই থেকে স্বভাবের গুণেই পশ্চাদপসরণ করেন। সে পশ্চাদপসরণে আপাত জয়লাভের কোনও প্রশ্ন থাকেনা, মানসিক শান্তিরও না। কিন্তু একটা তাৎক্ষণিক স্বস্তি থাকে। এঁরা আঘাত করতে চান না, আঘাত পেতেও চান না। যাকে তাঁরা কাজ বলে মনে করেন তার মধ্যেই নিমগ্ন থাকতে চান। সেই কাজ ও সাধনার সময় নষ্ট করে অন্যের যাত্রাভঙ্গ করার প্রচলিত মনোবৃত্তির তাঁরা ঘোর বিরোধী। আঘাত পেলে তার প্রতিত্রিয়ায় এঁরা অভিমান সংক্ষুদ্ধ হন, আঘাতকারীদের এড়িয়ে চলেন, মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারাতে থাকেন। দ্বদ্বারে করাঘাত পর্যন্ত এঁদের ধাতে সয় না। গানে যদি খোলে তো হাত দিয়ে সে দ্বারোদঘাটনের কথা এঁরা ভাবতে পারেন না। এ বিশ্বের কোনও কিছু ছিনিয়ে কিংবা যুদ্ধ করে করায়ত্ত করার কথা এঁরা ভাবতে পারেন না। এ বিশ্বের কোনও কিছু ছিনিয়ে কিংবা যুদ্ধ করে করায়ত্ব করার পক্ষপাতী এঁরা নন। শম্ভু মিত্র এই প্রজাতির মানুষ। মানুষ ও শিল্পী। ফ্যাসিবিরোধী বা প্রগতি লেখক সংঘে তিনি যে যোগ দিয়েছিলেন তাতে একটা আদর্শগত টানও ছিল। ১৯৪৩ সালে বোম্বাই-এ কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসের সময় কলকাতা থেকে বিজন ভট্টাচার্য, সুধী প্রধান, বিষ্ণু দে, সুচিত্রা মিত্র প্রমুখের সঙ্গে শম্ভু মিত্রও গিয়েছিলেন। পার্টি কংগ্রেসের পাশাপাশি সেবার প্রগতি লেখক সম্মেলনও ছিল। গণনাট্যে তিনি তখন রীতিমতো সত্রিয় । স্পিরিট অব ইন্ডিয়া অনুষ্ঠান সংগঠনে কিংবা নবান্ন প্রযোজনায় তাঁর সাংগঠনিক শক্তি ও শিল্পীসত্তা প্রতিষ্ঠিত। পার্টির উঁচুতলায় স্বয়ং পি.সি. যোশির কাছের মানুষ হয়ে উঠেছেন। তৃপ্তির সঙ্গে বিয়ের অনুষ্ঠান তো যোশির উপস্থিতিতেই হয়েছিল খাজা আহমেদ আববাসের বাড়িতে। সেই গণনাট্য সংঘে মুত্তধারা নিয়ে তাঁকে কথা শুনতে হয়েছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন---- পার্টিতে তখন কালচারাল ফ্রন্ট নিয়ে দুটো মত ছিল। একটা হল যে, শিল্পীদের নিজের মতো করে চলতে দাও----তাদের ওপর অযথা নিয়ন্ত্রণ চাপিওনা। আববাসের ধরতি কে লাল, নবান্ন এভাবেই জন্ম নিয়েছিল। দ্বিতীয় মতটি হল নিয়ন্ত্রণবাদী। এক শ্রেণীর নেতৃত্বের ধারণা হল, বড্ড বেশি কালচার হয়ে যাচ্ছে, বাবু কালচারের জন্ম হচ্ছে ইত্যাদি, অতএব নিয়ন্ত্রণ কর। শম্ভু মিত্র এই নিয়ন্ত্রণের কাছে নিজের শিল্পী সত্তাকে বন্ধক দিলেন না। উনি আই. পি. টি. এ. ছেড়ে দিলেন। তখন যোশিও পার্টিতে

নেই। নিয়ন্ত্রণবাদীদের অনেক কটু কাটব্য তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। সে কথা অনুযোগের সুরে কখনও বলতেও শোনা গেছে কীভাবে ওঁকে প্যার্টিমহল থেকে ব্যঙ্গ করা হচ্ছে। কিভাবে অন্যায্য আক্রমণ করা হচ্ছে। এমনকি ১৯৫১ সালে তঁার নিজের সংস্থা বহুরূপীতে যখন চার অধ্যায় নিয়ে তিনি নিমগ্ন তখনও তাঁর অনেক কমিউনিস্ট বন্ধু প্রমোদ শুনেছিলেন। বেরিয়ে এলেও গণনাট্যর সঙ্গে নাকি তাঁর একটা শিথিল সম্পর্ক অনেকদিন ছিল। চার অধ্যায়-এ রবীন্দ্রনাথ সন্ত্রাসবাদীদের কটাক্ষ করেছেন। পার্টির মধ্যে তখন সন্ত্রাসবাদী দ্বন্দ্ব প্রকট। রবীন্দ্রবিরোধী মনোভাবও প্রকাশ্যে এসে পড়েছে। এই রকম পরিস্থিতিতে চার অধ্যায় প্রযোজনা অনেকেই ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। বহুবছর পরে অবশ্য সেইসব ষ্ট বন্ধুদের কেউ কেউ মেনেছিলেন যে সঠিক সময়েই শম্ভু চার অধ্যায়টা করেছিল। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার আয়োজিত নাট্যোৎসবে এই চার অধ্যায় কেই আমরা দেখেছি। সুভাষ মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন----- মনে হয় একটা অভিমান ওঁকে একাকীত্বের পথে এগিয়ে নিয়েছে। কমিউনিস্টরা ওঁর প্রতি একটা অসম্ভব ঠান্ডা ব্যবহার করলেন। আবার যাঁদের কাছে উনি হৃদয়ের উত্তাপ আশা করেছিলেন তাঁরাও সময় মতো সরে গেল।

একদা তাঁর নেতৃত্বে বাঙলা নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতি রাজ্য সরকারের কাছে উপযুক্ত একখন্ড জমি চেয়ে পায়নি সে কথা অনেকেরই জানা। কিন্তু যেটা আজও অজ্ঞাত তা হল ঠিক কী কারণে শম্ভু মিত্র একটি আদর্শ নাট্যকেন্দ্র গড়েতোলার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায়ের এমনকি রাজভবনে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বসেও ব্যর্থ হলেন সেটা। দ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত জানিয়েছেন---- চূড়ান্ত মিটিং -এর ডাক পেয়ে একদিন আমি, অজিতেশ, সবিতাব্রত দত্ত, উদয়শংকর এবং শম্ভু মিত্র গিয়েছি মেয়রের সঙ্গে আলোচনায় বসতে। গিয়ে দেখি আরও পাঁচ - সাত ভাগিদার সেখানে বসে আছে। এবং সকলেই উচচস্বরে তাদের দাবি জানিয়ে চলেছে। একখন্ড জমির জন্যই। একসময় শম্ভুদা বললেন যে আমরা কর্পোরেশনের আমন্ত্রণে দ্বি - পাক্ষিক আলোচনায় বসেছিলাম। জানতামই না এক টুকরো জমির জন্যে এতগুলো লোক মিলে এখানে ঝগড়া করবে। উত্তেজিত হয়ে শম্ভু মিত্র শকুন্ত চিত্রকল্পটির ব্যবহার করেছিলেন। সবাই তখন তাঁকে আক্রমণ করে। তাঁর সেই ভয়াবহ রক্তিম মুখটি দেখেছিলাম, আজও ভুলিনি।

কারা সেই শকুন্ত ভাগিদার সেকথা দ্রপ্রসাদ জানাননি। নাট্যজগতের অনেকেই জানেন। তিতিবিরক্ত শম্ভু মিত্র অবশেষে জমি প্রসঙ্গে সিদ্ধার্থ রায়কে বলেছিলেন, তুমি অন্তত একজন কাউকে দাও। আমাদের পরস্পরকে লড়িয়ে দিওনা।

দেননি। কাউকেই দিয়ে যাননি সিদ্ধার্থ রায়। নিজেই বিদায় হয়ে গেলেন সাতাত্তরে। নির্বাচনে শোচনীয় পতন হল তাঁর সরকারের ।নবাগত বামফ্রন্ট সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ১৯৭৮ সালে দেখা করলেন শম্ভুমিত্রের সঙ্গে। অনুরোধ জানালেন রক্তকরবীর চলচিচত্রায়ন ও জাতীয় নাটমঞ্চের ব্যাপারে উদ্যোগ নেবার। কিন্তু ততদিনে শম্ভু মিত্রের অভিমান নাকি প্রজ্ঞার নিরাসক্তিতে পৌঁছে গেছে। তিনি অনেক পরামর্শ দেবার পর প্রস্তাব দুটি প্রত্যাখ্যান করেন।

কিন্তু ১৯৮০ সালে ক্যালকাটা রেপার্টরীর গালিলেওর জীবন - এ অভিনয় করতে রাজি হয়ে উদ্যোক্তাদের এমন আশ্বাসও দিয়েছিলেন যে রেপর্টারীর অন্য তিরিশ চল্লিশ লাখ টাকা তোলা যায় তবে ভবিষ্যৎ কাজের জন্য একটা জায়গা ও বড় মঞ্চের ব্যবস্থ হতে পারে। দ্রপ্রসাদ বলছেন--- দু এক জোড়া সন্ধিগ্ধ চোখের দিকে তাকিয়ে কিঞ্চিৎ চুপ করে থেকে বললেন ভাবছ এতে আমার খুব নাম হবে। আমার তো নাম আছেই। আর তোমরা যখন এই কাজটা সম্পূর্ণ করবে তখন তো আমি বেঁচে থাকবনা। সবটাই তোমাদের হবে।

একটা বড় খটকা লাগে এখানে। ১৯৮০ সালে যদি নাটমঞ্চের জন্য তাঁর এই উৎসাহ থেকে থাকে তবে ১৯৭৮ সালে বুদ্ধদেবের প্রস্তাবে সায় দিলেন না কেন? সরকারি ব্যবস্থাপনার আশঙ্কায়?

দাম্পত্য জীবনের নিবিড় সখ্য অনেক আগেই শেষ হয়েছিল। একমাত্র সন্তান যখন অসমবয়সী এবং বিবাহবিচ্ছিন্ন ন

াট্যকর্মীকে স্বামীত্বে বরণ করেন তখন স্বাভাবিভাবেই কিছু পারিবারিক উত্তাপ ঘনীভূত হওয়া সম্ভব। শিল্পী - জীবনে এসব ঘটনা খুব বড় হয়ে দেখা দিতে পারে কি? শেষ পর্যন্ত মেয়ের সে বিবাহিত জীবনও স্থায়ীরূপ পায়নি। সংসারে তিনটি ম ানুষ যেন তিনটি দ্বীপের বাসিন্দা। ১৯৮৯ সালে তাঁর যৌবনের সহচারী সহধর্মিণী, নাট্য - স্বর্ণযুগের অনন্য নাটিকা, নন্দিনী তৃপ্তি মিত্রের মৃত্যু যেন আরও গভীর লৌহযবনিকার আড়ালে নিয়ে গেল রক্তকরবীর রাজাকে। মেয়ে শাঁওলির ন াথবতী অনাথবৎ কিংবা কথা অমৃত সমান -এ তাঁর অদৃশ্য পরামর্শের স্পর্শ ছিল না তা নয়। কিন্তু মেয়েকে অবলম্বন করে নতুন করে বেঁচে ওঠার রাস্তাও কি খোলা ছিল না আর? অভিমান কি উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর রক্তমজ্জায় বহমান ছিল?

গ্লিম্পসেস অফ এ জিনিয়স -এ প্রসঙ্গত এক জায়গায় শম্ভু মিত্র বলেছেন যে একসময় থিয়েটার থেকে অবসর নিতে চেয়েছিলেন তিনি। অথচ থিয়েটার আমাকে তাড়াতে পারবেনা বলে যে মানুষ তাঁর দৃঢ় সংকল্প ও দায়বদ্ধতা ঘোষণা করেন, তিনি কেন থিয়েটার বর্জনের কথা ভাবেন স্বাভাবিক ভাবেই এ প্রশ্ন উঠে আসতে পারে। জীবনের সায়াহ্নে পৌঁছে সেই নির্মম সত্যটুকু শম্ভু মিত্র গোপন করে যাননি, যে সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ালে আমাদের অনেক সরকারি বেসরকারি সাংস্কৃতি পুরোধা, অনেক মঞ্চ কাঁপানো নাট্যব্যক্তিত্বেরও ভেতরটা শিরশির করে উঠবে ঃ 'Sometimes man is cornered from all directions'. রাজা সেনও জানেন, তাঁকে কত লোক কতভাবে অপমান করেছেন, তাঁর সম্পর্কে মিথ্যে কথা বলেছেন, কিন্তু কখনও কোনওদিন কোনো মানুষের সম্পর্কে কোনো খারাপ সমালোচনা করেননি। এদেরই কুম্ভীরাশ্রু ফেলার যাবতীয় সুযোগ নিজের হাতে বন্ধ করে গেছেন শম্ভু মিত্র তাঁর অভূতপূর্ব ইচ্ছাপত্রের মাধ্যমে। জীবনে অনেক কিছু এড়াতে চেয়েছেন, মরণেও অনেক কিছু এড়িয়ে গেলেন।

তবু প্রশ্ন থাকে। তাঁর ইচ্ছাপত্রে যে অগণিত মহোদয় মানুষদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতায় সকলকে শেষবারের মতো ঐকা ন্তিক নমস্কার জানিয় গেলেন, সেই অজস্র সাধারণ লোক কিন্তু বিগত দুই দশক ধরে বঞ্চিত। কোণঠাসা করার দলে তারা তো কোনওদিনই ছিল না। তারা তো শম্ভু মিত্রের অভিনয় ও প্রযুক্তি দেখার জন্য ভোরবেলায় ঘর ছেড়ে পথে এসে নেমেছে, অনাবিল করতালিতে প্রেক্ষাগৃহ মুখরিত করেছে, সর্বোপরি তাঁকে থিয়েটারের রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছে। সেই একুশ বছর বয়সে কলকাতায় জ্যোতিনাথ ঘোষের স্নেহচ্ছায়ায় লালিত গৃহশিক্ষক কোনও এক শম্ভু মিত্রকে যারা বিশুদ্ধ প্রাণের আবেগে রাজতিলক পরিয়েছিল, একটি সুভদ্র নমস্কার ছাড়া তাদের হিরণ্যগর্ভ রাজার কাছে আর কিছুই কি প্রাপ্য ছিল না? তিনি তো অনুধাবন করতেন, কত নিন্দা কত ঈর্ষা সমালোচনার নামে কটুক্তি এবং পরশ্রীকাতরতার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে সেই দুর্গম সত্যের পথে চলতে হয়েছে অটল তীর্থযাত্রীর মতো। এই সব দংশন নিশ্চয় তাঁর ভেতরটায় রক্ত ঝরাত।

যত রক্তই ঝরাক না কেন, সেই অটল তীর্থযাত্রী তো স্বীয় কর্মপথে নির্ভয়ে এগিয়েছেন ----যাত্রার মধ্যপথে আত্মনির্ব াসনের পথ বেছে নেননি। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সৃষ্টিকর্মে নিয়োজিত থেকেছেন। তবে কেন রবীন্দ্র - ভাবদ্যুতি - সুবলিত শম্ভু মিত্রের সৃষ্টির পথ এমন করে আকীর্ণ হয়? কোন আত্মাভিমানে ? সে কি অঙ্গীকারের চেয়েও বড় ?

এখন কারও কারও লেখার মধ্যে এমন ভাবনাও উঠে আসছে যে, একটু সাহসী এবং অনুসন্ধানী হলেই অনেক কিছু জানা যাবে। তাতে যদি মানুষ হিসাবে তিনি নিজে বা অন্য কেউ খানিকটা খাটোও হয়ে যান, আফসোশের কিছু থাকবেনা।

অতএব সংশ্লিষ্ট নাট্যপুরোধাগণ নির্মোহচিত্তে এগিয়ে আসুন। যাবতীয় কুয়াশার বুক চিরে যুগসন্ধির সেই অকথিত কা হিনি আলোয় নিয়ে আসুন। তাঁরা তো জানেন, 'the truth attains a quality only when it becomes controversial'.

তথ্যকেন্দ্র, জুলাই ১৯৯৭